দ্বাদশ অধ্যায়

জীবের বংশগতি ও বিবর্তন

MAIN TOPIC

বংশগতি

পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলো বংশানুক্রমে সন্তান সন্ততির দেহে সঞ্চারিত হওয়ার প্রক্রিয়াই হল বংশগতি।

বংশগতিবস্তু:

- ক্রোমোজোম
- জিন
- ডিএনএ (DNA)
- আরএনএ (RNA)

১. ক্রোমোজোম:

- ১৮৭৫ সালে বিজ্ঞাণী Strasbuger প্রথম ক্রোমোজোম আবিষ্কার করেন।
- দৈর্ঘ্য → 3.5 থেকে 30.00 মাইক্রন
  প্রস্থ → 0.2 থেকে 2.00 মাইক্রন
- মানবদেহে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। এদের মধ্যে ২২ জোড়া অটোসোম।
  ১ জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম।

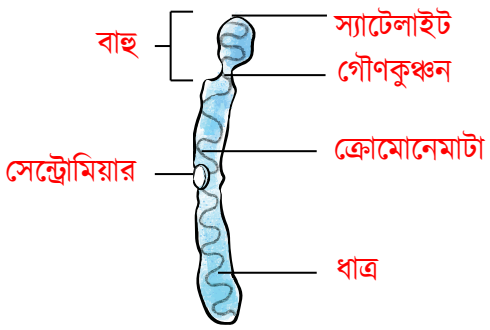

চিত্রঃ ক্রোমোজোম

কাজ:

1. বংশগতির ধারক ও বাহক হিসাবে কাজ করে।
2. বংশগতির ভৌত ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।
3. মানুষের চুলের রং, চামড়ার রং, চুলের প্রকৃতি, চোখের রং, চামড়ার গঠন নির্ধারণ করে।

২. ডিএনএ (DNA)

- ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান হলো ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড।
- DNA দুই সূত্র বিশিষ্ট পলিনিউক্লিওটাইডের সর্পিলাকার গঠন।
- একটি সূত্র অন্যটির পরিপূরক।

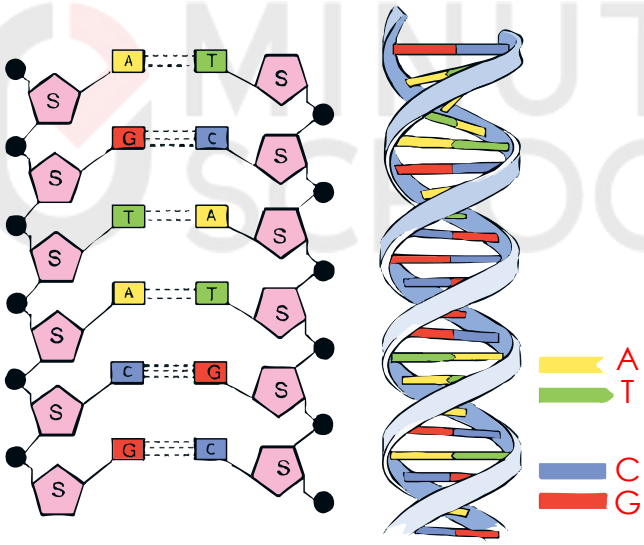

চিত্রঃ DNA

উপাদান:

1. পাঁচ কার্বনযুক্ত শর্করা।
2. নাইট্রোজেন বেস বা ক্ষার।
3. অজৈব ফসফেট।

নিউক্লিওটাইড: পাঁচ কার্বনযুক্ত শর্করা, নাইট্রোজেন বেস বা ক্ষার এবং অজৈব ফসফেটকে একত্রে নিউক্লিওটাইড বলে।

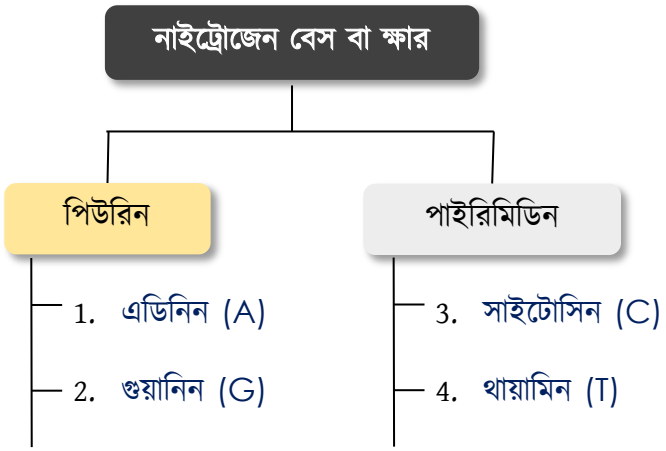

বেস সংযুক্তি:

- একটি সূত্রের এডিনিন অন্য সূত্রের থায়ামিন (T) এর সাথে ২টি হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে যুক্ত থাকে। যেমনঃ A=T
- একটি সূত্রের গুয়ানিন অন্য সূত্রের সাইটোসিনের সাথে ৩টি হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে যুক্ত থাকে। যেমনঃ G≡C
- হেলিক্সের প্রতিটি পূর্ণ ঘূর্ণন 34Å দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এবং একটি পূর্ণ ঘূর্ণনের মধ্যে ১০টি নিউক্লিওটাইড জোড়া থাকে।
- পার্শ্ববর্তী ২টি নিউক্লিওটাইডের দূরত্ব 3.4Å ।
- ১৯৫৩ সালে Watson এবং Crick প্রথম DNA অণুর ডাবল হেলিক্স বা দ্বি-সূত্রী কাঠামোর বর্ণনা দেন।

কাজ:

- DNA ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান এবং বংশগতির রাসায়নিক ভিত্তি।
- DNA জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্ররকৃত ধারক এবং বাহক, যা জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সরাসরি বহন করে মাতাপিতা থেকে তাদের বংশধরে নিয়ে যায়।

DNA অনুলিপন (DNA replication)

- এই প্রক্রিয়ায় একটি DNA অণু থেকে আরেকটি নতুন DNA অণু তৈরি হয় বা সংশ্লেষিত হয়।
- DNA অর্ধ রক্ষণশীল পদ্ধতিতে অণুলিপিত হয়।
- এই পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন বন্ধন ভেঙ্গে গিয়ে DNA সূত্র দুটি আলাদা হয়ে যায়।
- তখন কোষের ভিতর ভাসমান নিউক্লিওটাইডগুলো থেকে A এর সাথে T, T এর সাথে A, C এর সাথে G এবং G এর সাথে C যুক্ত হয়ে সূত্রদুটি তার পরিপূরক সূত্র তৈরি করে।
- DNA এর দুটি সূত্রের ভিতর একটি পুরাতন সূত্র রয়ে যায় এবং তার সাথে একটি নতুন সূত্র যুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ DNA অণুর সৃষ্টি হয়।
- অর্ধেক নতুন ও অর্ধেক পুরাতন নিয়ে গঠিত বলে একে অর্ধরক্ষণশীল পদ্ধতি বলে।

চিত্রঃ DNA অনুলিপন

৩. আরএনএ (RNA):

- RNA হলো রাইবোনিউক্লিক এসিড।
- RNA তে একটি পলিনিউক্লিওটাইডের সূত্র থাকে।

উপাদান:

1. পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট রাইবোজ সুগার
2. নাইট্রোজেন বেস
3. অজৈব ফসফেট

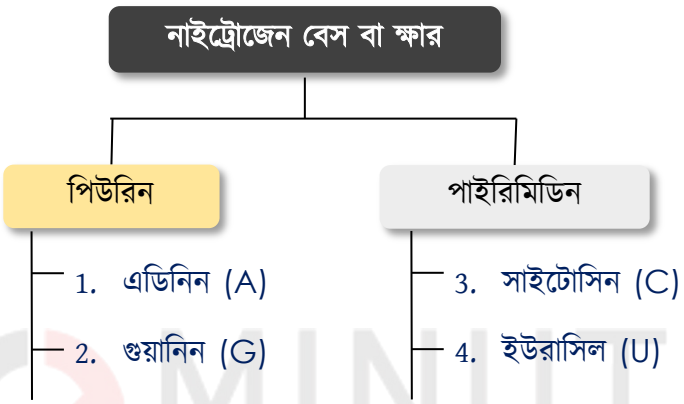

বেস সংযুক্তি:

- $A = U$
- $G \equiv C$

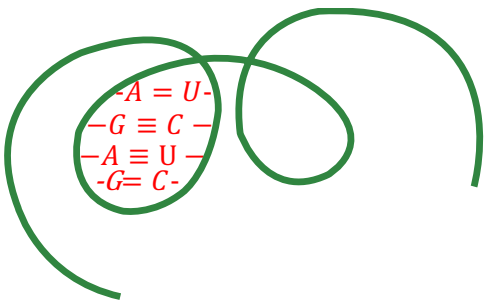

চিত্রঃ RNA

৪. জিন:

জীবের সব দৃশ্য এবং অদৃশ্যমান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ণত্রণকারী এককের নাম জিন।

অবস্থান: জীবের ক্রোমোজোমে।

লোকাস: ক্রোমোজোমের যে স্থানে জিন অবস্থান করে তাকে লোকাস বলে বা আরো স্পষ্টভাবে বললে ক্রোমোজোমের যে নির্দিষ্ট স্থানে যে নির্দিষ্ট জিন পাওয়া যায় ,ঐ স্থানটি উক্ত জিনটির লোকাস।

➢ জিন হচ্ছে বংশগতির নিয়ন্ত্রক।

➢ $DNA \rightarrow RNA \rightarrow$ প্রোটিন $\rightarrow$ বৈশিষ্ট্য

➢ জিন দুই প্রকার। যথা:

1. প্রকট জিন
2. প্রচ্ছন্ন জিন

➢ গ্রেগর জোহান মেন্ডেলকে বংশগতি বিদ্যার জনক বলা হয়।

মেন্ডেলের পরীক্ষা:

T T= লম্বা হওয়ার জন্য দায়ী

t t= খাটো হওয়ার জন্য দায়ী

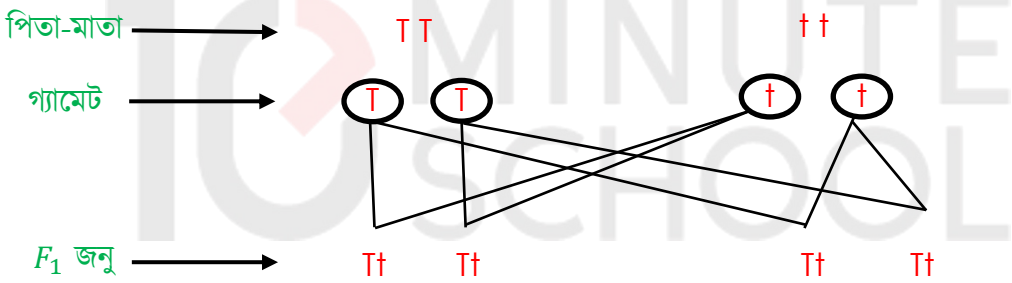

সুতরাং, F_1 ধাপে সবগুলো লম্বা হবে।

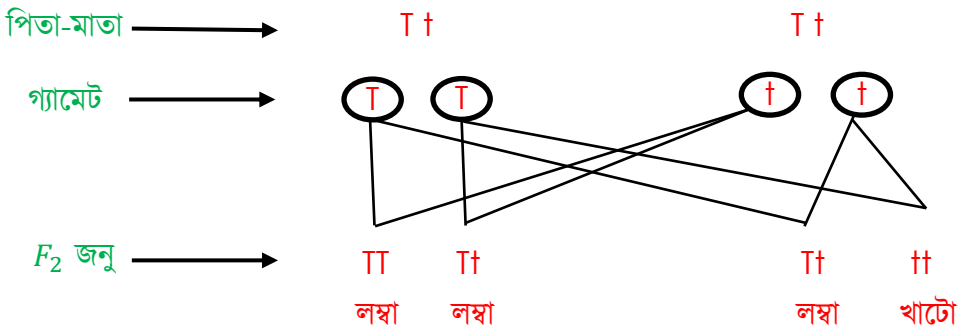

প্রকট: প্রকট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে বৈশিষ্ট্য যেটি প্রথম বংশধরে প্রকাশ পায়।

প্রচ্ছন্ন: যে বৈশিষ্ট্য প্রথম বংশধরে প্রকাশ পায় নাই কিন্তু ২য় বংশধরে 3:1 অনুপাতেপ্রকাশ পায় সেটি হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য।

মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ:

- মানবদেহে ক্রোমোজোম সংখ্যা ২৩ জোড়া।
- ২২ জোড়া হচ্ছে অটোসোম এবং ১ জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম।

44 অটোসোম + $XY \rightarrow$ ছেলে

44 অটোসোম + $XX \rightarrow$ মেয়ে

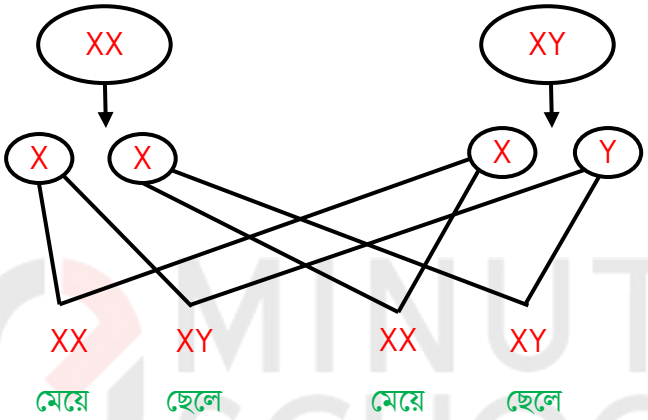

- নারীদের ডিপ্লয়েড কোষে ২ টি সেক্স ক্রোমোজোমই x ক্রোমোজোম অর্থাৎ xx। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে দুটির মধ্যে একটি x এবং অপরটি y ক্রোমোজোম অর্থাৎ xy।
- নারীদের ডিম্বাশয়ে ডিম্বানু তৈরি করার সময় যখন মিয়োসিস বিভাজন ঘটে, তখন প্রতিটি ডিম্বানু অন্যান্য ক্রোমোজোমের সাথে একটি করে x ক্রোমোজোম লাভ করে।
- অন্যদিকে পুরুষে শুক্রানু সৃষ্টির সময় অর্ধেক সংখ্যক শুক্রানু একটি করে x এবং বাকি অর্ধেক শুক্রানু একটি করে y ক্রোমোজোম লাভ করে।
- ডিম্বানু পুরুষের x ও y বহনকারী যেকোনো একটি শুক্রানু দিয়ে নিষিক্ত হতে পারে।
- গর্ভধারনকালে কোন ধরনের শূক্রানু মাতার x বহনকারী ডিম্বানুর সাথে মিলিত হয়ে তার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ সন্তানের লিঙ্গ।

জেনেটিক ডিসঅর্ডার

(a) কালার ব্লাইন্ডনেস বা বর্নান্ধতা

- যখন কেউ কোনো রঙ সঠিকভাবে চিনতে পারে না, তখন তাকে কালার ব্লাইন্ডনেস বা বর্নান্ধতা বলে।
- আমাদের জেনেটিক ডিসঅর্ডারগুলো x ক্রোমোজোমের কারণে ঘটে থাকে।
- কালার ব্লাইন্ড অবস্থায় রোগীদের চোখে স্নায়ুকোষের রং শনাক্তকারী পিগমেন্টের অভাব থাকে।
- যদি কারো একটি পিগমেন্ট না থাকে তখন সে লাল আর সবুজ পার্থক্য করতে পারে না।
- সাধারণত পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রতি ১০ জনে ১ জনকে কালার ব্লাইন্ড হতে দেখা যায়।

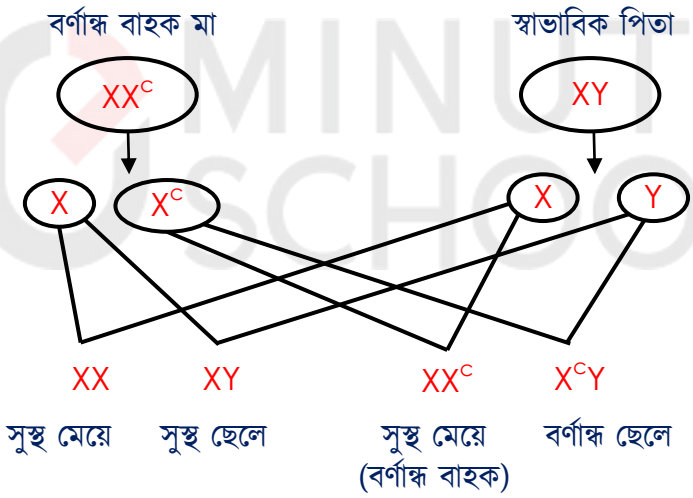

(b) থ্যালাসেমিয়া

- রক্তের লোহিত রক্ত কণিকার এক অস্বাভাবিক অভাবজনিত রোগের নাম থ্যালাসেমিয়া।
- থ্যালাসেমিয়া একটি অটোসোমাল রিসিসিভ ডিসঅর্ডার। অর্থাৎ, বাবা ও মা উভয়ই এ রোগের বাহক বা রোগী হলে তবেই তা সন্তানে রোগলক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পায়।
- লোহিত রক্তকোষ দুই ধরনের প্রোটিন দিয়ে তৈরি। যথা-
  1. α- গ্লোবিউলিন
  2. β- গ্লোবিউলিন

α – থ্যালাসেমিয়া : যখন α-গ্লোবিউলিন তৈরির জিন অনুপস্থিত থাকে কিংবা ত্রুটিপূর্ণ থাকে তখন তাকে α-থ্যালাসেমিয়া বলে।

β – থ্যালাসেমিয়া : যখন β-গ্লোবিউলিন তৈরির জিন অনুপস্থিত বা ত্রুটিপূর্ণ থাকে তখন তাকে β-গ্লোবিউলিন বলে।

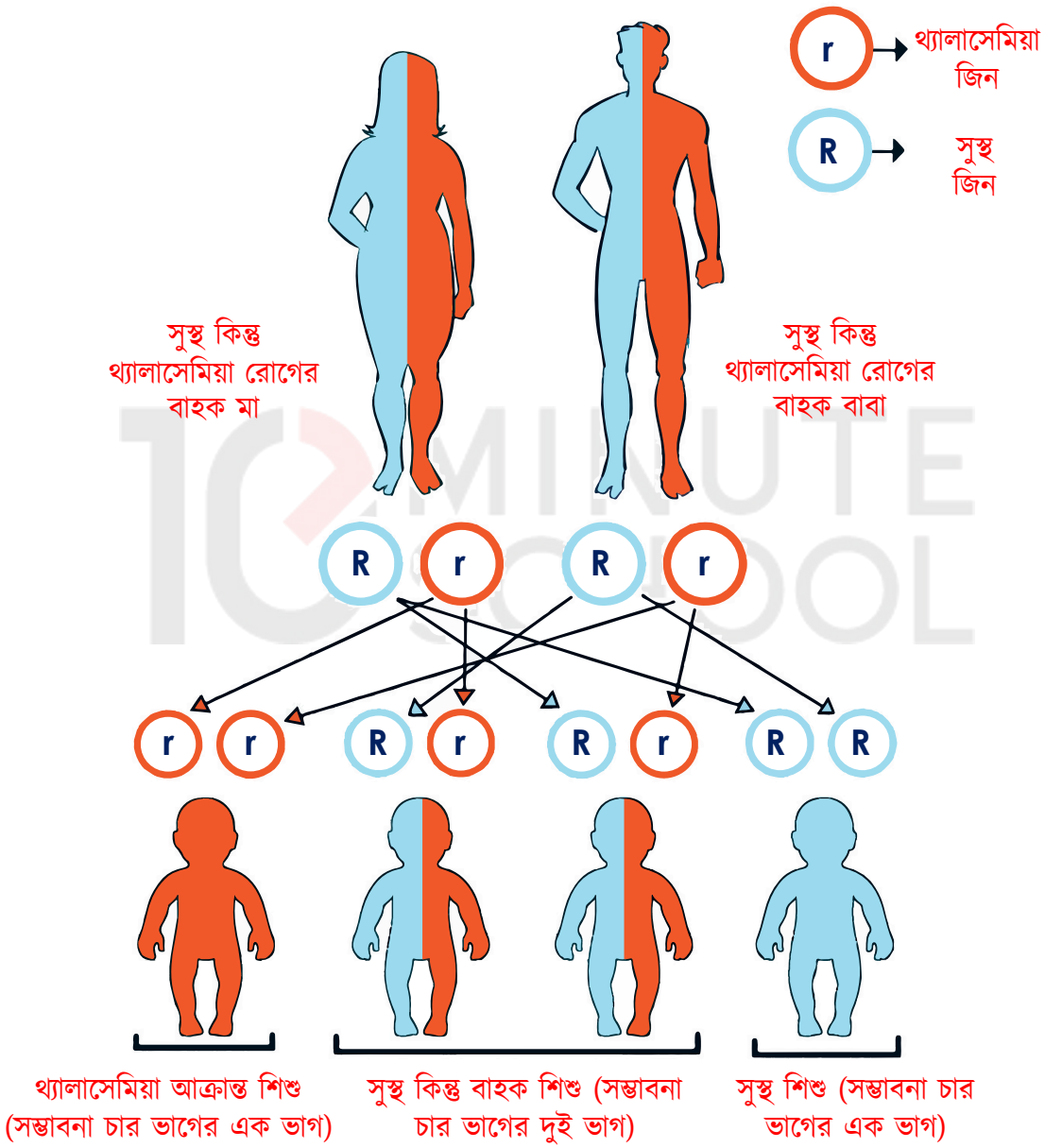

চিত্রঃ বাহক বাবা এবং বাহক মায়ের সন্তান দের ভিতর থ্যালাসেমিয়া সন্তান জন্মের সম্ভাবনা চার ভাগের এক ভাগ

জৈব বিবর্তন

জৈব বিবর্তন তত্ত্ব :

বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীতে আমরা যেসব জীবের সঙ্গে পরিচিত, তাদের মধ্যে প্রায় তেরো লক্ষ প্রাণীপ্রজাতি এবং চার লাখের মতো উদ্ভিদ-প্রজাতিকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। একসময় মানুষের ধারণা ছিল, পৃথিবী অপরিবর্তিত, অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীর যে আকার বা আয়তন ছিল, তার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তারা ভাবতো, আদি জীবজগতের সঙ্গে বর্তমানকালের জীবজগতের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জেনোফেন (Xenophane) নামের একজন বিজ্ঞানী প্রথম কতকগুলো জীবাশ্ম (fossil) আবিষ্কার করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে জীবদেহের আকার অপরিবর্তনীয় নয়, অর্থাৎ অতীত এবং বর্তমান যুগের জীবদেহের গঠনে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle) প্রমাণ করেন যে জীবজগতের বিভিন্ন জীবের ভিতর এক শ্রেণির জীব অন্য শ্রেণির জীব থেকে উন্নত এবং সেই জীবগুলো তাদের পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বিবর্তনের (বা অভিব্যক্তি) মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তিত এবং রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। সাধারণত বিবর্তন একটি মন্থর এবং চলমান প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠনগতভাবে সরল জীবন থেকে ধীরে ধীরে জটিল জীবনের উৎপত্তি ঘটেছে। তবে খুব কম সময়ের মধ্যে বিবর্তন সংঘটিত হওয়ার নজিরও বর্তমান।

সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত অনুসারে, প্রায় সাড়ে চারশত কোটি বছর (সাড়ে চার বিলিওন) আগে সূর্য থেকে সৃষ্ট এই পৃথিবী একটি উত্তপ্ত গ্যাস-পিণ্ড ছিল। এই উত্তপ্ত গ্যাস-পিন্ড ক্রমাগত তাপ বিকিরণ করায় এবং তার উত্তাপ কমে যাওয়ায় ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পরে এই পিণ্ডটি বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে ক্রমশ কঠিন হতে থাকে এবং উদ্ভূত জলীয় বাষ্প থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়। ঐরকম মেঘ থেকে বৃষ্টি হওয়ায় পৃথিবীর কঠিন বহিঃস্তরে জলভাগ অর্থাৎ সমুদ্রের আবির্ভাব ঘটে। এক সময়ে সমুদ্রের পানিতে প্রাণের আবির্ভাব হয় এবং সমুদ্রের পানিতে সৃষ্ট জীবকুলের ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে বর্তমানের বৈচিত্র্যময় জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে।

গভীর যুক্তিনির্ভর চিন্তাভাবনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আধুনিক মানুষের ধারণা হয়েছে যে জীব সৃষ্টির মূলেই রয়েছে বিবর্তন। ল্যাটিন শব্দ 'Evolveri' থেকে বিবর্তন শব্দটি এসেছে। ইংরেজ দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) প্রথম ইভোলিউশন কথাটি ব্যবহার করেন। এক সময় বলা হতো, যে ধীর, অবিরাম এবং চলমান পরিবর্তন দিয়ে কোনো সরলতর নিম্নশ্রেণির জীব থেকে জটিল এবং উন্নততর নতুন প্রজাতির বা জীবের উদ্ভব ঘটে, তাকে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি বা ইভোলিউশন বলে। তবে বিবর্তন সব সময় ধীর গতিতে ঘটে না, পরিবেশের কারণে অনেক সময় দ্রুত ঘটতে দেখা গেছে। শুধু তা-ই নয়, বিবর্তনের কারণে জটিল জীব সরলতর রূপ নিয়েছে তারও উদাহরণ আছে। মেক্সিকান কেভ ফিশ পানির উপরের স্তর থেকে সরে গিয়ে গভীর পানিতে অন্ধকার গুহায় বাস করতে শুরু করার কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। কাজেই এখন বিবর্তন বা ইভোলিউশনের সংজ্ঞা জিনের অ্যালিলের মাধ্যমে দেওয়া হয় (একটি নির্দিষ্ট জিন একাধিকভাবে থাকতে পারে, তখন সেই জিনটির ভিন্ন ভিন্ন রূপকে তার অ্যালিল বলা হয়)। কার্টিস-বার্নস (1989) প্রদত্ত আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে, বিবর্তন হলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে নির্দিষ্ট এলাকায় এক কিংবা কাছাকাছি প্রজাতির অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন।

ধরা যাক, সুন্দরবনের সমস্ত বাঘের সবগুলো জিন নির্ণয় করে তার একটি তালিকা করা হলো, যেখানে কোন জিনের কোন অ্যালিল কতগুলো করে আছে, সেটিও হিসাব রাখা হয়েছে। বেশ কিছু বছর পরে পরবর্তী কোনো প্রজন্মের সকল বাঘের সবগুলো জিন নির্ণয় করে আবার কোন অ্যালিল কতগুলো করে আছে, সেটিও হিসাব করা হলো। তারপর দুই প্রজন্মের জিনগুলো তুলনা করে যদি দেখা যায়, এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মে কোনো জিনের কোনো অ্যালিলের সংখ্যার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে, তাহলে বলা যাবে, বাঘের এই পপুলেশনটিতে বিবর্তন ঘটছে

জীবনের আবির্ভাব :

পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ বর্তমানে প্রচলিত আছে। তবে জীবনের উৎপত্তি যে প্রথমে সমুদ্রের পানিতে হয়েছিল, এ সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যে যুক্তি রেখেছেন, সেগুলো এরকম: প্রথমত, অধিকাংশ জীবকোষ এবং দেহস্থ রক্ত ও অন্যান্য তরলে নানারকম লবণের উপস্থিতি, যার সঙ্গে সমুদ্রের পানির খনিজ লবণের সাদৃশ্য রয়েছে। দ্বিতীয়, সমুদ্রের পানিতে এখনো অনেক সরল এবং এককোষী জীব বসবাস করে।

পৃথিবীতে কীভাবে জীব সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত অনুমান এরকম: প্রায় 260 কোটি বছর আগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং জলীয় বাষ্প, নাইট্রোজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছিল; কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস ছিল না। অহরহ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটত এবং বজ্রপাতের ফলে ও অতিবেগুনি রশ্মির

প্রভাবে এই যৌগ পদার্থগুলো মিলিত হয়ে অ্যামাইনো এসিড এবং নিউক্লিক এসিড উৎপন্ন করে। ল্যাবরেটরিতে এই প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করে প্রমাণ করা হয়েছে। পরে অ্যামাইনো এসিড এবং নিউক্লিক এসিড মিলিত হওয়ায় নিউক্লিওপ্রোটিন অণুর সৃষ্টি হয়। নিউক্লিওপ্রোটিন অণুগুলো ক্রমে নিজেদের প্রতিরূপ-গঠনের (replication) ক্ষমতা অর্জন করে এবং জীবনের সূত্রপাত ঘটায়। পৃথিবীর উৎপত্তি এবং তার ধারাবাহিকতায় জীবনের উৎপত্তির ঘটনাপ্রবাহকে বলে রাসায়নিক বিবর্তন বা অভিব্যক্তি।

ধারণা করা হয়, প্রোটিন এবং নিউক্লিক এসিড সহযোগে সৃষ্টি হয় নিউক্লিওপ্রোটিন। এই নিউক্লিওপ্রোটিন থেকেই সৃষ্টি হয় প্রোটোভাইরাস এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় ভাইরাস। ভাইরাস এমন একটা অবস্থা নির্দেশ করে, যা জীব এবং জড়ের মধ্যবর্তী অবস্থা। এরপর সম্ভবত উদ্ভব হয় ব্যাকটেরিয়া এবং আরও পরে সৃষ্টি হয় প্রোটোজোয়া। ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়াস আদি প্রকৃতির, তাই এদেরকে আদি কোষ বলা হয়। পরে প্রোটোজোয়াদের দেহে দেখা গেল সুগঠিত নিউক্লিয়াস। কিছু এককোষী জীবদেহে সৃষ্টি হলো ক্লোরোফিল, ফলে একদিকে যেমন খাদ্য সংশ্লেষ সম্ভব হলো, তেমনি খাদ্য সংশ্লেষের উপজাত (by product) হিসেবে অক্সিজেন সৃষ্টি হতে শুরু করল। তখন সবাত শ্বসনকারী জীবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। উদ্ভব হলো এককোষী থেকে বহুকোষী জীব। এরপর একদিকে উদ্ভিদ ও অপরদিকে প্রাণী—দুটি ধারায় জীবের অভিব্যক্তি বা বিবর্তন শুরু হলো। জীবনের উদ্ভব তথা রাসায়নিক বিবর্তনের আরও কিছু সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আছে, তবে উপরে উল্লিখিত ব্যাখ্যাটিই এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। বিবর্তন প্রকৃতপক্ষে সরলরেখায় ঘটে না, অসংখ্য জটিল শাখা-প্রশাখায় প্রতিনিয়ত ঘটে চলে বিবর্তন, চিত্রে তার একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে।

ডারউইনবাদ বা ডারউইনের মতবাদ :

ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন জীববিজ্ঞান তথা সমগ্র বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সৃষ্টি করেন। বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (Charles Robert Darwin, 1809-1882) ইংল্যান্ডের স্রাসবেরি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণকালে তিনি ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদ এবং প্রাণিকুলের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য দেখে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে 1837 খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তনের প্রায় 20 বছর পরে 1859 খ্রিষ্টাব্দে 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা প্রজাতির উদ্ভব' (Origin of Species by Means of Natural Selection) নামে একটি বইয়ে তাঁর মতবাদটি প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, ডারউইনের তত্ত্বটি বিবর্তন তত্ত্ব নামে প্রচলিত হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে বিবর্তনের আবিষ্কারক নন। এ অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে জৈব বিবর্তন যে প্রকৃতই ঘটে তা খ্রিষ্টপূর্ব সময় থেকেই বিজ্ঞানীরা জানতেন। ডারউইনের সাফল্য ছিল, জৈব বিবর্তনের কারণ হিসেবে পর্যাপ্ত সংখ্যক বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে একটি প্রক্রিয়ার (mechanism) ধারণা প্রতিষ্ঠা করা যা, বিবর্তনের যাবতীয় বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবে। জৈব বিবর্তনের কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে উল্লেখ করে আরও একজন সমসাময়িক ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী, আলফ্রেড ওয়ালেস (Alfred Russel Wallace, 1823-1913), একই সময়ে কিন্তু স্বাধীনভাবে অনুরূপ তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে তাঁর চেয়ে ডারউইনের নামেই তত্ত্বটি অধিক প্রচলিত।

ডারউইনের দৃষ্টিতে প্রকৃতিতে সংঘটিত সাধারণ সত্যগুলো :

(a) **অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি :** ডারউইনের মতে, অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি করাই জীবের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এর ফলে জ্যামিতিক এবং গাণিতিক হারে জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ: একটি সরিষা গাছ থেকে বছরে প্রায় 730,000 টি বীজ জন্মায়। এই 730,000 বীজ থেকে 730,000 সরিষা গাছের জন্ম হওয়া সম্ভব। একটি স্ত্রী স্যামন মাছ প্রজনন ঋতুতে প্রায় 3 কোটি ডিম পাড়ে। ডারউইনের মতে, এক জোড়া হাতি থেকে উদ্ভূত সকল হাতি বেঁচে থাকলে 750 বছরে হাতির সংখ্যা হবে এক কোটি নব্বই লাখ।

(b) **সীমিত খাদ্য ও বাসস্থান :** ভূপৃষ্ঠের আয়তন সীমাবদ্ধ হওয়ায় জীবের বাসস্থান এবং খাদ্য সীমিত।

(c) **অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম :** জীবের জ্যামিতিক ও গাণিতিক হারে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় এবং খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত থাকায় জীবকে বেঁচে থাকার জন্য কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। ডারউইন এ ধরনের সংগ্রামকে 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' বলে অভিহিত করেন। ডারউইন লক্ষ করেন যে জীবনে তিনটি পর্যায়ে এই সংগ্রাম করতে হয়। সেগুলো হচ্ছে:

i. **আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম (interspecific struggle):** উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ব্যাঙ কীটপতঙ্গ খায়, অন্যদিকে সাপ ব্যাঙদের খায়। আবার, ময়ূর সাপ এবং ব্যাঙ দুটোকেই খায়- এভাবে নিতান্ত জৈবিক কারণেই বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্কের একটি নিষ্ঠুর জীবনসংগ্রাম গড়ে ওঠে।

ii. **অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম (intraspecific struggle):** একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যদের খাদ্য এবং বাসস্থান একই রকমের হওয়ায় এদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এরা নিজেদের মধ্যেই বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা শুরু করে; উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে একটি দ্বীপে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে গেল খাদ্য এবং বাসস্থান সীমিত থাকায় তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যেই সংগ্রাম শুরু করে। সবল প্রাণীগুলো দুর্বল প্রাণীদের প্রতিহত করে গ্রাসাচ্ছাদন করে। ফলে দুর্বল প্রাণীগুলো কিছুদিনের মধ্যেই অনাহারে মারা পড়ে।

iii. **পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম (struggle with environment):** বন্যা, খরা, ঝড়-ঝা , বালিঝড়, ভূমিকম্পন, অগ্ন্যুৎপাত— এ ধরনের প্রতিকূল পরিবেশ জীবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। সুতরাং জীবকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রতিনিয়ত এসব প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। যে প্রাণীগুলো এই পরিবেশে টিকে থাকতে পারে, তারা বেঁচে থাকে অন্যরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। উদাহণস্বরূপ বলা যায় যে উত্তর এবং মধ্য আমেরিকার কোয়েল পাখি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও তুষারপাতের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

(d) **প্রকরণ বা জীবদেহে পরিবর্তন:** চার্লস ডারউইনের মতে, পৃথিবীতে দুটি জীব কখনোই অবিকল একই ধরনের হয় না। যত কমই হোক এদের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকে। জীব দুটির মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তাকে প্রকরণ (variety) বা পরিবৃত্তি (mutation) বলে। অনুকূল প্রকরণ অস্তিত্বের জন্য জীবনসংগ্রামে একটি জীবকে সাহায্য করে।

(e) প্রাকৃতিক নির্বাচন : ডারউইন তত্ত্বের এই প্রতিপাদ্যটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনুকূল (বা অভিযোজনমূলক) প্রকরণ সমন্বিত জীবেরা অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, এই প্রক্রিয়াকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে। অনুকূল প্রকরণ সমন্বিত জীবেরা প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যা বেঁচে থাকে এবং অত্যধিক হারে বংশবিস্তার করে। অপরদিকে, প্রতিকূল প্রকরণসম্পন্ন জীবেরা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়।

ডারউইনের মতবাদ অনুসারে পরিবর্তিত পরিবেশে যে জীবটি খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তাকে "যোগ্য" আখ্যা দিয়ে অনেক সময় সহজ করে বলা হয়, যোগ্য জীবটি পরিবেশে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে টিকে থাকবে।

(f) নতুন প্রজাতির উৎপত্তি : যেসব প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে সুবিধাজনক প্রকরণ দেখা যায়, প্রকৃতি তাদের নির্বাচন করে এবং তাদের লালন করে। সুবিধাজনক প্রকরণযুক্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদ পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে এবং অযোগ্যদের তুলনায় বেশি হারে বংশবিস্তার করতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে এদের বংশধরদের মধ্যে প্রকরণগুলো যায়। এই বংশধরদের মধ্যে আবার যাদের সুবিধাজনক প্রকরণ বেশি থাকে, প্রকৃতি আবার তাদের নির্বাচন করে। এভাবে যুগ-যুগান্তর ধরে নির্বাচিত করে করে প্রকৃতি প্রাণী ও উদ্ভিদের নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করে। বর্তমানে বংশগতিবিদ, কোষতত্ত্ববিদ এবং শ্রেণিবিদগণ নতুন প্রজাতির উৎপত্তির বিষয়ে বংশগতিবিদ্যা মতবাদের এবং বিবর্তন তত্ত্বের ভিত্তিতে বলেন, তিনটি ভিন্ন উপায়ে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে:

(a) মূল প্রজাতির থেকে পৃথক হয়ে (isolation) যাওয়ার ফলে

(b) সংকরায়ণের (hybridization) ফলে এবং

(c) সংকরায়ণ প্রজাতিতে কোষ বিভাজনের সময় ঘটনাক্রমে কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা বৃদ্ধির (Polyploidy) ফলে। এর ফলে নতুন জীবটির অভিযোজন ঘটবে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা একটি নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হবে।

প্রজাতির টিকে থাকায় বিবর্তনের গুরুত্ব:

বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভবকালে দেখা যায় অনেক প্রজাতি কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে ডাইনোসরের কথা বলা যায়। দেখা গেছে সময়ের সাথে যে প্রজাতিটির টিকে থাকার ক্ষমতা যত বেশি, সে বিবর্তনের আবর্তে তত বেশি দিন টিকে থাকতে পারে। অর্থাৎ যে পরিবেশ, জীবনপ্রবাহ ও জনমিতির মানদণ্ডে বিবর্তনে যে যত বেশি খাপ খাওয়াতে পারবে, সেই প্রজাতিটি টিকে থাকবে। বিবর্তনের পথে খাপ খাওয়ানোর এই প্রক্রিয়াকে অনেক ক্ষেত্রে অভিযোজন (adaptation) বলা হয়।

বিবর্তন যে শুধু প্রকৃতির কোলে ঘটে, তা নয়। গবেষণাগারে পরীক্ষামূলকভাবে বিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। এটিও বিবর্তনের বাস্তবতার প্রমাণ। বিবর্তনের বিপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। জীবজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যতই সমৃদ্ধ হচ্ছে, বিবর্তনকে অস্বীকার করা ততই অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

SOLVED CQ

১. ক্রোমোজোম – x

ক্রোমোজোম – y

উভয় ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান পলিনিউক্লিওটাইড যাতে থায়ামিন বিদ্যমান।

ক. লোকাস কী?

খ. থ্যালাসেমিয়া বলতে কী বুঝায়?

গ. উদ্দিপকে উল্লেখিত পলিনিউক্লিওটাইডটির রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ কর।

ঘ. লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে উদ্দিপকের উল্লেখিত ক্রোমোজোমগুলোর ভূমিকা বর্ণনা কর।

উত্তর

ক. ক্রোমোজোমের যে স্থানে জিন অবস্থান করে তাকে লোকাস বলে।

খ. থ্যালাসেমিয়া হল লোহিত রক্তকণিকার এ অস্বাভাবিক অবস্থার নাম।

এই রোগে রক্তের লোহিত রক্ত কণিকাগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ফলে রোগী রক্ত শূন্যতায় ভোগে। এই রোগ বংশ পরম্পরায় হয়ে থাকে। লোহিত রক্ত কোষ দুই ধরণের প্রোটিন দিয়ে তৈরি, α গ্লোবিউলিন ও β গ্লোবিউলিন। লোহিত রক্ত কণিকার এই দুটি প্রোটিনের জিন নষ্ট, থাকার কারণে ত্রুটিপূর্ন লোহিত রক্ত কণিকা উৎপন্ন হয় যার ফলে থ্যালাসেমিয়া দেখা দেয়।

গ. উদ্দিপকে উল্লেখিত ক্রোমোজোমের যেই পলিনিউক্লিওটাইডটির কথা বলা হয়েছে তা হল DNA।

DNA এর রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে পাচঁ কার্বন যুক্ত শর্করা, নাইট্রোজেন ঘটিত বেজ বা ক্ষার এবং অজৈব ফসফেট। এই তিনটি পদার্থকে একত্রে নিউক্লিওটাইড বলে। DNA এর নাইট্রোজেন বেজগুলো দুই ধরণের, পিউরন ও পাইরিমিডিন। এডিনিন ও গুয়ানিন বেজ হল পিউরন এবং সাইটোসিন ও থায়ামিন বেজ হল পাইরিমিডিন। একটি সূত্রের থায়ামিন (T) অন্য সূত্রের এডিনিনের (A) সাথে দুটি হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা যুক্ত থাকে (A = T) এবং একটি সূত্রকের গুয়ানিন (G) অন্য সূত্রের সাইটোসিনের সাথে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা যুক্ত থাকে (G = C)। অর্থাৎ এই বন্ধনগুলো সব সময় একটি পিউরন ও পাইরিমিডিনের মধ্যে হয়ে থাকে। হেলিক্সের প্রতিটি পূর্ণ ঘূর্ণণ 34A° দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এবং এই পূর্ণ ঘূর্ণণের মধ্যে 10 টি নিউক্লিওটাইড থাকে।

ঘ. উদ্দিপকে দুটি ক্রোমোজোম দেখানে হয়েছে একটি হল x ক্রোমোজোম অন্যটি হল y ক্রোমোজোম। আমরা জানি মানব দেহ ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। এদের মধ্যে ২২ জোড়াকে অটোজোম বলে। আর এই দুই জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম চিহ্নিত করা হয় x ও y দ্বারা।

লিঙ্গ নির্ধারণে এই দুই জোড়া ক্রোমোজোমের ভূমিকা অপরিসীম। মানুষ এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীতে একইভাবে লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয়। নারীদের কোষে দুটি সেক্স ক্রোমোজোমই X ক্রোমোজোম XX, কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে দুটি ক্রোমোজোমের মধ্যে একটি Y এবং অপরটি X ক্রোমোজোম ডিম্বানু পুরুষের X বা Y বহনকারী যে কোন একটি শুক্রানু দ্বারা নিষিক্ত হতে পারে। গর্ভ ধারণকালে কোন ধরণের শুক্রানু মাতার X ক্রোমোজোম বহনকারী ডিম্বানুর সাথে মিলিত হবে তার উপর নির্ভর করে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ।

নিষেকের সময় যদি X বহনকারী শুক্রানু ডিম্বানুর সাথে নিষেক ঘটায় তাহলে জাইগোট হবে XX, অর্থাৎ সন্তান হবে কন্যা। আর যদি Y বহনকারী শুক্রানু নিষেক ঘটায় তাহলে জাইগোট হবে XY, অর্থাৎ সন্তান হবে পুত্র।

উক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি লিঙ্গ নির্ধারণ ক্ষেত্রে উদ্দিপকে উল্লেখিত ক্রোমোজোম দুটি (X, Y) মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

২.

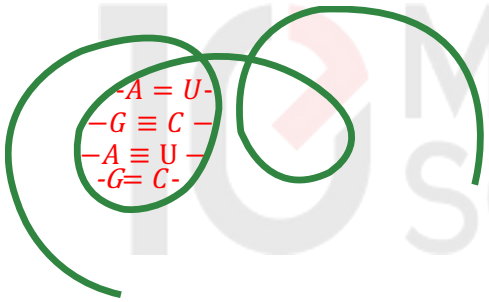

A

B

ক. DNA এর পূর্ণ রূপ কী?

খ. বর্ণান্ধতা বলতে কী বোঝ?

গ. চিত্র A এর গঠন উপাদান ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উল্লেখিত B বস্তুটির মাধ্যমে কীভাবে অপরাধী শনাক্ত করা সম্ভব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর

ক. DNA এর পূর্ণরূপ হল Deoxyribo Nucleic Acid.

খ. যখন কেও কোন রং সঠিকভাবে চিনতে পারে না সেটি হচ্ছে কালার ব্লাইন্ডনেস বা বর্ণান্ধতা।

রং চেনার জন্য আমাদের চোখের স্নায়ু কোষে রং শনাক্তকারী পিগমেন্ট থাকে। কালার ব্লাইন্ড রোগীর চোখে রং শনাক্তকারী পিগমেন্টের অভাব থাকে এবং সেই ব্যক্তি লাল আর সবুজ রং পার্থক্য করতে পারে না। একাধিক পিগমেন্টের অনুপস্থিতি থাকলে লাল – সবুজ রং ছাড়াও অনেকে নীল হলুদ রঙের পার্থক্যও করতে পারে না। এই রোগটি প্রধানত বংশগতিক ব্যাধি।

গ. উদ্দিপকে চিত্র A হল RNA যার পূর্ণরূপ হলো Ribonucleic Acid. এর গঠন উপাদান নিম্নে আলোচনা করা হলো –

RNA হলো এক সূত্র বিশিষ্ট পলিনিউক্লিওটাইড। এত পাচঁ কার্বন বিশিষ্ট রাইবোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট এবং নাইট্রোজেন বেজ থাকে। নাইট্রোজেন বেসগুলো হলো এডিনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C) এবং ইউরাসিন (U) RNA ভাইরাসের ক্রোমোজেমে স্থায়ী উপাদান হিসেবে RNA পাওয়া যায়। কিন্তু কিছু সংখ্যক ভাইরাসের ক্ষেত্রে DNA অনুপস্থিত যেমন: TMV, Tobacco, Mosaic Virus. অর্থাৎ যে সমস্ত ভাইরাস DNA দিয়ে গঠিত নয় তাদের নিউক্লিক এসিড হিসেবে থাকে RNA। এসব ক্ষেত্রে RNA ই বংশগতির বস্তু হিসেবে কাজ করে।

ঘ. উদ্দিপকে উল্লেখিত B বস্তুটি হল DNA। বর্তমান শতাব্দীতে ডি এন এ প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং এর ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ এবং ঔষধ শিল্পে এব নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। প্রচলিত সাক্ষ্য – প্রমাণ ও প্রত্যক্ষদর্শী নির্ভর বিচার ব্যাবস্থার পাশাপাশি আজ বাংলাদেশেও সুবিচার পাওয়ার এক নতুন উপায় হচ্ছে ডি এন এ টেস্ট।

অপরাধী শনাক্ত করণে ডি এন এ টেস্টের যেই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় তা হলো ডি এন এ ফিঙ্গার প্রিন্টিং। ডি এন এ টেস্ট সুম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন হয় জৈবিক নমুনা। ব্যক্তির হাড়, দাঁত, চুল, রক্ত, লালা ইত্যাদি মূল্যাবান নমুনা হতে পারে। অপরাধস্থান কিংবা অপরাধের শিকার এমন ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ করা জৈবিক নমুনার ডি এন এ নকশাকে সন্দেহভাজনের কাছ থেকে নেওয়া জৈবিক নমুনার নকশার সাথে মিলানো হয়।

এর পর বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপরাধ স্থল থেকে প্রাপ্ত নুমনার সাথে সন্দেহভাজনের নমুনার মিল, অমিল চিহ্নিত করে তুলনা করা হয়। এই পদ্ধতির নাম ডি এন এ ফিঙ্গার প্রিন্টিং। বর্তমানে পলিমারেজ চেইন বিক্রিয়া বা পিসি আর পদ্ধতিতে আরও নিপুনভাবে অল্প নমুনা ব্যবহার করে নির্ভূলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

৩.

চিত্র: X

ক. জিন কী?

খ. একটি চিহ্নিত চিত্র অংকনের মাধ্যমে নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোমের অবস্থান চিহ্নিত কর।

গ. উদ্দিপকে X এর গঠন বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দিপকের X কে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলা হয় কেন?

উত্তর

ক. জীবের সকল দৃশ্য ও অদৃশ্যমান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী এককের নাম জিন।

খ. নিম্নে নিউক্লিয়াসের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করে ক্রোমোজোমের অবস্থান চিহ্নিত করা হল:

নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ক্রোমাটিন তন্তু কোষ বিভাজনের সময় মোটা ও খাটো হয়ে ক্রোমোজোমে পরিণত হয়।

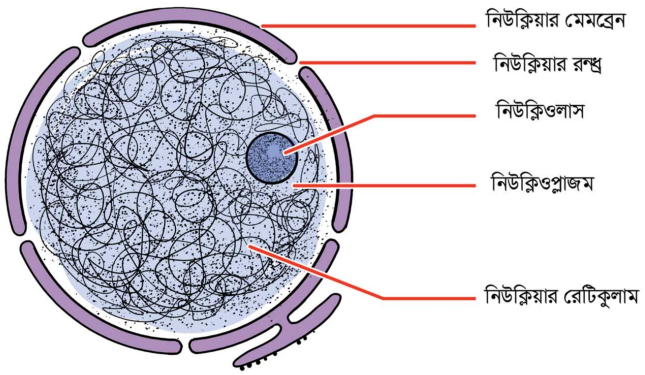

চিত্র: নিউক্লিয়াস

গ. উদ্দিপকে X চিত্রটি হল ক্রোমোজোমের। নিম্নে ক্রোমোজোমের গঠন বর্ণনা করা হল:

বংশগতির প্রধান উপাদান হচ্ছে ক্রোমোজোম। এটি নিউক্লিয়াসের নিউক্লিওপ্লাজমে বিস্তৃত এবং সূত্রাকার ক্রোমাটিন দিয়ে গঠিত। প্রজাতির বৈশিষ্ট্যভেদে কোষে এর ডিপ্লয়েড (দুই সেট ক্রোমোজোম যার এক সেট পিতা থেকে আসে এবং আর এক সেট মাত থেকে আসে) সংখ্যা ২ হতে ১৬০০ পর্যন্ত হতে পারে। একটি ক্রোমোজেম দৈর্ঘ্যে সাধারনত 3.5 থেকে 30.0 মাইক্রন এবং প্রস্থে 0.2 থেকে 2.0 মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে। ক্রোমাটিড, ক্রোমাটিন, সেন্ট্রোমিয়ার, ক্রোমোমিয়ার ইত্যাদি নিয়ে ক্রোমাজোম গঠিত হয়।

ঘ. উদ্দিপকের X হলো ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়। ক্রোমোজেম বংশগতির প্রধান উপাদান কারণ এতে অসংখ্য জিন রয়েছে।

জীবের সব দৃশ্য এবং অদৃশ্যমান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী এককের নাম জিন। এর অবস্থান জীবের ক্রোমোজোমে ক্রোমোজেমের যে স্থানে জিন অবস্থান করে তাকে লোকাস বলে। সাধারণত একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট জিন থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক জিন মিলিতভাবে একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে।

ক্রোমোজোমের কাজ হল মাতা পিতা থেকে জিন বহন করে সন্তান সন্ততিতে নিয়ে যাওয়া। জিনই মূলত জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের চোখের রং, চুলের প্রকৃতি, চামড়ার গঠন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ক্রোমোজোম কতৃক বাহিত হয়ে বংশগতির ধারা অক্ষুণ্ন রাখে। এজন্য ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলা হয়।

৪. বিবর্তন হলো বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যর পরিবর্তন যা এক বংশধর হতে পরবর্তী বংশধরে স্থানান্তরিত হয়। চার্লস ডারউইন প্রথম প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভিত্তিতে বিবর্তনের ব্যাখ্যা দেন।

ক. বংশগতিরবিদ্যার জনক কে?

খ. ডি এন এ অনুলিপন বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দিপকের আলোকে 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের দিকটি আলোচনা কর।'

ঘ. 'অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রাম' – ডারউনের এই মতবাদটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

ক. গ্রেগর জোহান মেন্ডেলকে বংশগতিবিদ্যার জনক বলা হয়।

খ. DNA অনুলিপন (DNA replication) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি DNA অনু থেকে আরেকটি নতুন DNA অনু তৈরি হয় বা সংশ্লেষিত হয়। DNA অর্ধরক্ষণশীল পদ্ধতিতে অনুলিপিত হয়। এই পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন বন্ধন ভেঙে গিয়ে DNA সূত্র দুটি আলাদা হয়ে যায়।

তখন কোষের ভিতর ভাসমান নিউক্লিওটাইড গুলো থেকে A এর সাথে T , T এর সাথে A , C এর সাথে G এবং C এর সাথে G যুক্ত হয়ে নতুন সুত্র তৈরি করে। DNA এর দুটি সুত্রকের ভিতর একটি পুরাতন সুত্র রয়ে যায়, তার সাথে একটি নতুন সুত্র যুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ DNA অনুর সৃষ্টি করে।

গ. বিবর্তন হলো বংশগতির বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন যা এক বংশধর থেকে পরবর্তী বংশধরে স্থানান্তরিত হয়। ব্রিটিম প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন বিবর্তনের এমন কিছু তথ্য প্রকাশ করেন যা বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি বৈপ্লবিক চিন্তা ধারার সৃষ্টি করে। ডারউইন তত্ত্বে "প্রাকৃতিক নির্বাচন" এই প্রতিপাদ্যটি সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অনুকূল প্রকরণ সমন্বিত জীবেরা অন্যদের সাথে প্রতিযোগীতায় বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, এই প্রক্রিয়াকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে। অনুকূল প্রকরণ দ্বারা সমন্বিত জীবেরা প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হয়ে তুলনামূলকাভাবে বেশি সংখ্যা বেচেঁ থাকে এবং অত্যধিক হারে বংশবিস্তার করে। অপরদিকে প্রতিকূল প্রকরণ সম্পন্ন জীবেরা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারেনা। ফলে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়।

ডারউইনের মতবাদ অনুসারে পরিবর্তিত পরিবেশ যে জীবটি খাপ খাইয়ে নিতে পারে তাকে যোগ্য আখ্যা দিয়ে অনেক সময় সহজ করে বলা হয়, যোগ্য জীবটি প্রতিযোগীতায় জয়ী হয়ে পরিবেশে টিকে থাকবে।

ঘ. জীবের জ্যামিতিক ও গাণিতিক হারে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় এবং খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত থাকায় জীবকে বেচেঁ থাকার জন্য প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হতে হয়। ডারউইন এ ধরণের সংগ্রামকে "অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম" বলে অভিহিত করেন।

অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামকে ডারউইন তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেন। সেগুলো হল:

(i) আন্ত : প্রজাতিক সংগ্রাম।

(ii) অন্ত : প্রজাতিক সংগ্রাম।

(iii) পরিবেশের সাথে সংগ্রাম।

(i) আন্ত : প্রজাতিক সংগ্রাম: উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ব্যাঙ কীট পতঙ্গ খায়, অন্যদিকে সাপ ব্যাঙেদের খায়। আবার ময়ুর সাপ ও ব্যাঙ দুটোকেই খায়। এভাবে নিতান্ত জেবিক কারণেই বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে খাদ্য – খাদক সম্পর্কের একটি নিষ্ঠুর জীবন সংগ্রাম গড়ে ওঠে।

(ii) অন্ত : প্রজাতিক সংগ্রাম: একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের খাদ্য এবং বাসস্থান একই রকমের হওয়ায় এদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এরা নিজেদের মধ্যেই বেচে থাকার প্রতিযোগীতা শুরু করে। অর্থাৎ সবল প্রাণীগুলো দুর্বল প্রাণীদের প্রতিহত করে গ্রাসাচ্ছাদন করে, ফলে দুর্বল প্রাণীগলো কিছুদিনের মধ্যেই আনাহারে মারা পড়ে।

(iii) পরিবেশের সাথে সংগ্রাম: বন্যা, খরা, বালিঝড়, ভূমি কম্পন, অগ্নুৎপাত – এধরনের প্রতিকূল পরিবেশ জীবের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত করে। সুতরাং জীবকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রতিনিয়ত এসব প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করতে হয়। যে প্রাণী গুলো সংগ্রাম করে এই পরিবেশেটিকে থাকতে পারে তারা বেচেঁ থাকে অন্যরা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৫. প্রতোভাইরাস → ভাইরাস → ব্যাক্টেরিয়া → প্রোটোজোয়া → বহুকোষী জীব → উদ্ভিদ
↘ প্রাণী

ক. রাসায়নিক বিবর্তন কাকে বলে?

খ. কয়টি উপায়ে নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হতে পারে এবং কী কী?

গ. প্রজাতিরটিকে থাকায় বিবর্তনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দিপকের নির্দেশীত প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর

ক. পৃথিবীর উৎপত্তি এবং তার ধারাবহিকতায় জীবনের উৎপত্তির ঘটনা প্রবাহকে রাসায়নিক বিবর্তন বলে।

খ. বর্তমানে বংশগতিবিদ, কোষতত্ববিদ, এবং শ্রেণীবিদ গণ নতুন প্রজাতির উৎপত্তি বিষয়ে বংশগতিবিদ্যা মতবাদের এবং বিবর্তন তত্ত্বের ভিত্তিতে বলেন, ৩টি ভিন্ন উপায়ে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে।

a. মূল প্রজাতি থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার ফলে।

b. সংকরায়নের ফলে।

c. সংকরায়ন প্রজাতিতে কোষ বিভাজনের সময় ঘটনাক্রমে কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে।

গ. যে সমস্ত বংশগতীয় পরিবর্তন এক বংশধর থেকে অন্য বংশধরে স্থানান্তরিত হয় তাকে বিবর্তন বলে। প্রকৃতিতে প্রজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বিবর্তনের গুরুত্ব অপরিসীম।

বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন প্রাজতি উদ্ভবকালে দেখা যায় অনেক প্রজাতি কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে ডাইনোসরের কথা বলা হয়। দেখা গেছে সময়ের সাথে যে প্রজাতিটির টিকে থাকার ক্ষমতা যত বেশি, সে বিবর্তনের আবর্তে তত বেশি দিন টিকে থাকতে পারে। অর্থাৎ যে পরিবেশ, জীবন প্রাবহ ও জনমিতির মানদন্ড যে যত বেশি খাপ খাওয়াতে পারবে, সেই প্রজাতিটি টিকে থাকবে। বিবর্তনের পথে খাপ খাওয়ানোর এই প্রক্রিয়াকে অনেক ক্ষেত্রে অভিযোজন বলা হয়ে থাকে।

বিবর্তন যে শুধু প্রকৃতির কোলে ঘটে তা নয়, গবেষনাগারে পরিক্ষামূলভাবে বিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। এটিও বিবর্তনের বাস্তবতার প্রমাণ। বিবর্তনের বিপক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। জীব জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যত সমৃদ্ধ হচ্ছে, বিবর্তনকে অস্বীকার করা ততই অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

উক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে প্রকৃতিতে প্রাণীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বিবর্তনের ভূমিকা অতুলনীয়।

ঘ. উদ্দিপকের উল্লেখিত প্রক্রিয়াটি হল জৈবিক বিবর্ত থেকে জীবনের আবির্ভাব। বিবর্তন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে নির্দিষ্ট এলাকায় এক কিংবা কাছাকাছি প্রজাতির অ্যালিন ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন।

পৃথিবীর উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল তা নিয়ে অনেক রকম ধারণা প্রচলিত থাকলে প্রথম জীবনের উৎপত্তি যে সমুদ্রের পানিতে হয়েছিল তা নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। সমুদ্রের পানিতে এখনও অনেক সরল এবং এককোষী জীব বসবাস করে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করে অহরহ আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাতে ফলে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রার বৃদ্দি ঘটত এবং বজ্রপাতের ফলে ও অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে এই যৌগ পদার্থ গুলো মিলিত হয়ে অ্যামাইনো এসিড ও নিউক্লিক এসিড উৎপন্ন করে।

ধারণা করা হয়, প্রোটিন এবং নিউক্লিক এসিড সহযোগে সৃষ্টি হয় নিউক্লিও প্রোটিন। নিউক্লিও প্রোটিন থেকেই সৃষ্টি হয়ে প্রোটো ভাইরাস এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় ভাইরাস।

এরপর সম্ভবত সৃষ্টি হয় ব্যাকটেরিয়া এবং আরও পরে সৃষ্টি হয় প্রটোজোয়া। ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়াস আদি প্রাকৃতির, তাই এদেরকে আদি কোষী বলা হয়। পরে প্রটোজোয়াদের দেহে দেখা গেল সুগঠিত নিউক্লিয়াস। কিছু এককোষী জীবদেহে সৃষ্টি হলো ক্লোরোফিল, ফলে একদিকে যেমন খাদ্য সংশ্লেষণ সম্ভব হলো অন্যদিকে উপজাত হিসেবে অক্সিজেন সৃষ্টি হতে শুরু করল। তখন স্বাত শ্বসনকারী জীবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। উদ্ভব হলো এককোষী থেকে বহুকোষী জীব। এর পর একদিকে উদ্ভিদ ও অপরদিকে প্রাণী – দুটি ধারায় জীবের অভিব্যক্তি বা বিবর্তন শুরু হলো।

SOLVED MCQ

১. নিচের কোনটিতে ইউরাসিল থাকে?

(ক) ক্রোমোজম
(খ) লোকাস
(গ) RNA
(ঘ) DNA

২. কোন রঙ এর বর্ণান্ধতাকে সর্বজনীন বর্ণান্ধতা বলা হয়?

(ক) লাল-নীল
(খ) লাল-বেগুনী
(গ) লাল-সবুজ
(ঘ) লাল-আসমানী

৩. লিউকোমিয়া রোগে কোন অঙ্গটি নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি আছে?

(ক) যকৃত
(খ) কিডনি
(গ) হৃৎপিন্ড
(ঘ) বৃক্ক

৪. বিভিন্ন জীবে জিনের সংখ্যা-

(ক) ২টি
(খ) ৩টি
(গ) এক নয়
(ঘ) ৪টি

৫. কোন প্রক্রিয়ায় একটি DNA অণু হতে আরেকটি DNA অণু তৈরি হয়?

(ক) ইমবাইবিশন
(খ) অনুশীলন
(গ) অনুলিপন
(ঘ) পরিপূরক

৬. কোন অবস্থায় রোগীদের চোখের স্নায়ুকোষের রঙ শনাক্তকারী পিগমেন্টের অভাব থাকে?

(ক) অন্ধ
(খ) প্রতিবন্ধী
(গ) অনুভূতিহীন
(ঘ) বর্ণান্ধতা

৭. কোন রোগে লোহিত রক্ত কণিকা নষ্ট হয়?

(ক) আর্থাইটিস
(খ) আমাশয়
(গ) অস্টিওপোরেসিস
(ঘ) থ্যালাসেমিয়া

৮. ক্রোমোজম প্রস্থে সাধারণত-

(ক) ০.২ থেকে ৩.০ মাইক্রন
(খ) 0.৫ থেকে ২.0 মাইক্রন
(গ) ০.২ থেকে ২.0 মাইক্রন
(ঘ) 0.১ থেকে ২.0 মাইক্রন

৯. সেক্স ক্রোমোজম কয়টি?

(ক) ৪ টি
(খ) ২টি
(গ) ১টি
(ঘ) ৪৪টি

১০. কোনটি জীববিজ্ঞানের বিশেষ শাখা?

(ক) Breeding
(খ) Medical Science
(গ) Genetics
(ঘ) Agriculture

১১. ডি এন এ প্রযুক্তি যেসব শিল্পে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে-

i. চিকিৎসাবিজ্ঞান
ii. মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ
iii. পোশাক শিল্প

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i , ii ও iii

১২.আদিকোষের DNA সাধারণত দেখতে কেমন?

(ক) গোলাকার
(খ) সূত্রাকার
(গ) সর্পিলকার
(ঘ) বহুভুজাকার

❑ নিচের প্রাপ্ত তথ্য হতে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জীবের ক্রোমোজমে অবস্থানরত সকল দৃশ্য ও অদৃশ্যমান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রনকারী একটি একক রয়েছে যা বংশগতির ধারক ও বাহক।

১৩. জীবের সব দৃশ্য ও অদৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রনকারী এককের নাম কী?

(ক) জিন
(খ) অটিজম
(গ) লোকাস
(ঘ) আশীল

১৪. উদ্দীপকের একটি দীর্ঘসময় ধরে অবস্থান করলে-

i. জিনের স্বকীয়তা বিনষ্ট হয়
ii. স্বকীয়তা বজায় রাখে
iii. গ্যামেট সৃষ্টির সময় পৃথক হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

১৫. এডিনিন ও গুয়ানিনকে কী বলা হয়?

(ক) সাইটোসিন
(খ) পিউরিন
(গ) থাইমিন
(ঘ) পাইরিমিডিন

১৬. পৃথিবীর সব জীবের ক্ষেত্রে কোন নিয়মটি প্রযোজ্য?

(ক) চারিত্রিক
(খ) প্রাকৃতিক
(গ) ঘৃণননীতি
(ঘ) নিজস্ব

১৭. থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে বলা যায়-

i. এই রোগ বংশ পরম্পরায় হয়ে থাকে

ii. এ রোগে রোগী রক্ত শূন্যতায় ভোগে

iii. এ রোগপ লোহিত রক্ত কণিকাগুলো নষ্ট হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

১৮. কোনটি লিঙ্গ নির্ধারনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে?

(ক) সেক্স ক্রোমোজম
(খ) অটোসোম
(গ) RNA
(ঘ) DNA

১৯. TMV ভাইরাসের ক্ষেত্রে বলা যায়-

(ক) DNA থাকে
(খ) CNA থাকে
(গ) DNA থাকে না
(ঘ) TMA থাকে না

২০. যে সমস্ত ভাইরাস DNA দ্বারা গঠিত নয় তাদের নিউক্লিক এসিড হিসেবে কী থাকে?

(ক) এডিনিন
(খ) গুয়ানিন
(গ) থায়মিন
(ঘ) RNA

২১. কোন রোগে আক্রান্ত রোগী রক্ত শূন্যতায় ভোগে?

(ক) এইডস
(খ) ক্যান্সার
(গ) আরথ্রাইটিস
(ঘ) থ্যালাসেমিয়া

২২. ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান কোনটি ?

(ক) DNA
(খ) RNA
(গ) TMV
(ঘ) লোকাস

২৩. গুয়ানিন কী ধরনের পদার্থ ?

(ক) ক্ষার
(খ) এসিড
(গ) লবণ
(ঘ) আয়ন

২৪. DNA হেলিক্সের প্রতিটি পূর্ণ ঘূর্ণনের দৈর্ঘ্য কত ?

(ক) 17 $\dot{A}$
(খ) 34 $\dot{A}$
(গ) 51 $\dot{A}$
(ঘ) 68 $\dot{A}$

২৫. DNA টেস্টের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয় -

i. হাড় থেকে
ii. দাঁত থেকে
iii. রক্ত থেকে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i , ii
(খ) i , iii
(গ) ii , iii
(ঘ) I , ii ও iii

২৬. সাধারণত প্রতি 10 জনে কতজন পুরুষ কালার ব্লাইন্ড হতে দেখা যায় ?

(ক) 1 জন
(খ) 2 জন
(গ) 3 জন
(ঘ) 4 জন

❑ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নয়ন একজন বর্ণান্ধ। সে স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন লিজাকে বিয়ে করে। কিছুদিন পর তাদের সন্তান হয়।

২৭. নয়নের রোগের জিনটির অবস্থান কোথায় ?

(ক) অটোজোম
(খ) সেক্স ক্রোমোজোম
(গ) নিউক্লিয়াস
(ঘ) মাইটোকন্ড্রিয়া

২৮. নয়ন ও লিজার বংশধরদের মধ্যে -

i. প্রথম বংশধরে সবাই স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন হবে
ii. প্রথম বংশধরে পুত্র বর্ণান্ধ হবে
iii. দ্বিতীয় বংশধরের একজন বর্ণান্ধ পুত্র হবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i , ii
(খ) i , iii
(গ) ii , iii
(ঘ) i , ii ও iii

২৯. DNA টেস্টের বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির নাম কি ?

(ক) PVC
(খ) PCR
(গ) ফিঙ্গারপ্রিন্ট
(ঘ) আলট্রাসনোগ্রাম

৩০. পিতামাতা হতে সন্তান-সন্ততিতে স্থানান্তরিত হয় -

i. ডিএনএ

ii. লাইসোজোম

iii. আরএনএ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i , ii
(খ) i , iii ✓
(গ) ii , iii
(ঘ) I , ii ও iii

৩১. থ্যালাসেমিয়ার লক্ষণ কোনটি ?

(ক) ক্ষুধামান্দ্য
(খ) রক্তশূন্যতা ✓
(গ) দৃষ্টিশক্তি হ্রাস
(ঘ) ঘন ঘন জ্বর হওয়া

৩২. নিচের কোনটি বংশগতির বস্তু নয় ?

(ক) NADP ✓
(খ) জিন
(গ) DNA
(ঘ) RNA

৩৩. নিউক্লিওটাইডের শর্করা কত কার্বন বিশিষ্ট ?

(ক) চার
(খ) পাঁচ ✓
(গ) ছয়
(ঘ) সাত

৩৪. RNA-এর ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য ?

(ক) A = T
(খ) G ≡ C
(গ) A ≡ C
(ঘ) A = U ✓

৩৫. সূক্ষ্ম সূতার ন্যায় DNA দেখা যায় -

i. ব্যাকটেরিয়ায়

ii. মানুষে

iii. কুনো ব্যাঙ-এ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i , ii

(খ) i , iii

(গ) ii , iii

(ঘ) I , ii ও iii

৩৬. থ্যালাসেমিয়া কয় ধরনের দেখা যায় ?

(ক) দুই

(খ) তিন

(গ) চার

(ঘ) পাঁচ

৩৭. বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীতে সকল জীবের মধ্যে কত লাখ উদ্ভিদ শনাক্ত সম্ভব হয়েছে ?

(ক) চার লাখ

(খ) আট লাখ

(গ) দশ লাখ

(ঘ) তেরো লাখ

৩৮. বেস অর্থ কী ?

(ক) অম্ল

(খ) ক্ষার

(গ) অম্লমান

(ঘ) লবণ

৩৯. TMV এর বৈশিষ্ট্য হলো -

i. এতে RNA আছে

ii. এতে DNA অনুপস্থিত

iii. এতে ইউরাসিল অনুপস্থিত

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i , ii ✓

(খ) i , iii

(গ) ii , iii

(ঘ) i , ii ও iii

৪০. কোন পদ্ধতিতে নিপুণভাবে অল্প নমুনা ব্যবহার করে নির্ভুল DNA প্রোফাইলিং করা যায় ?

(ক) Gel electrophoresis

(খ) Agarose gel electrophoresis

(গ) DNA probe

(ঘ) Polymerase Chain Reaction ✓